মানবাধিকারের অশনি সংকেত ও মেহার আরার

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

গত কয়েকদিন যাবৎ কানাডার মিডিয়াতে একটা খবর তোলপাড় ঢেউ তুলেছে । সেটা হচ্ছে মেহার আরার কাহিনী । মেহার আরার একজন সিরিয়ান- কানাডিয়ান। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে বাবা-মার সাথে কানাডার অভিবাসী হন। কানাডার ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেলিকমিউনিকেশনে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে প্রথমে বোষ্টনের একটা কম্পিউটার ফার্মে কাজ করেন - পরে অটোয়াতে নিজের ব্যবসা খুলে বসেন। পরিশ্রম করে একজন মেধাবী কমিউনিকেশন প্রকৌশলী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্টা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার স্ত্রী, তিউনিসিয়ান মুনিয়া মাজির সাথে পরিচয় হয় - পরে মুনিয়া গনিতে পিএইচডি অর্জন করে। দুই সন্তান নিয়ে মেহার - মুনিয়া আর দশটা সাধারন নাগরিকের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিলো । কিন্তু একটা অদৃশ্য মেঘ যে তাদের জীবনটাকে ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে তা তাদের কেহ বুঝতে পারেনি।

সেপ্টেম্বর ২০০১ এর অনেক আগে থেকেই একটা মেঘ মেহারকে অনুসরন করছিল- তা তার পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব হয়নি। একজন আইনমান্যকারী নাগরিক হিসাবে তাকে বিবেচনা করা যায়, কারন পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন অতীত রিপোর্ট দেখাতে পারেনি। পরিবারকে অটোয়ায় রেখে বোষ্টনে কাজের সুবাদে শতবার তাকে আমেরিকান এয়ারপোর্ট অতিক্রম করতে হয়েছে, কখনও তাকে কোন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়নি। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০২-এ তিউনিশিয়ায় পরিবারসহ ছুটি কাটানোর সময় জরুরী কাজে তাকে একা ফিরে আসতে হয়েছে । আর সে আসাটাই হলো তার জীবনের এক কঠিন ভ্রমন। যে কালো মেঘটা এতদিন অদৃশ্য ছিল - তা তাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলল।

সেপ্টেম্বর ২৬, ২০০২ - আরার নিউইয়র্ক জেকেএফ এয়ারপোর্টে বসে অপেক্ষা করছিল মন্ট্রয়লগামী নির্ধারিত বিমানের জন্যে। এরই মধ্যে এগিয়ে এলো আইএনএস এর কর্মকর্তারা। তাকে নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তারপর দীর্ঘদিন তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুনিয়া তিউনিস থেকে ছুটে এলো অটোয়া । পুলিশ - সরকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন যায়গায় ছুটাছুটি করে অবশেষে অক্টোবর ১০, ২০০২ এ জানতে পারলো তার স্বামী মেহার সিরিয়ার জেলে আছে। তারপর শুরু হলো মুনিয়ার কঠিন জীবন। ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পারার কারনে মুনিয়া সরকারের উপর মহলে বেশ আলোড়ন তুলতে পেরেছিল, ফলে সংসদে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে এক শুনানীতে তাকে ডাকা হয়। মুনিয়া আরো যেখানে সফল হয়েছে তা হলো জনমত গঠনের ক্ষেত্রে। জনমতের চাপে এবং কানাডা সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপে অবশেষে অক্টোবর ৬, ২০০৩ এ মেহার আরার মন্ট্রিয়ল এয়ারপোর্টে এসে নামে- যা তার আমেরিকায় আটকের পর ৩৭৫ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। আরার নিয়ে এসেছে সাথে করে এক ভয়াবহ স্মৃতি যা নভেম্বর ৪, ২০০৩ এ এক সংবাদ সন্মেলনে সে তার ভয়াবহ স্মৃতি সাধারন মানুষকে জানান যা সমগ্র কানাডিয়ান সমাজকে প্রবল ঝাকুনি দেয় - পশ্চিমের মানবাধিকারের অহংকারকে প্রশ্নের সন্মুখিন করে।

মেহার আরারের কি হয়েছিল এ ৩৭৫ দিনে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন :
http://www.cbc.ca/news/background/arar/arar_statement.html

এখানে তার অত্যাচারের বিসয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় আলাপ করা যাক। সেগুলো হচ্ছেঃ

১) কেন মেহার আরারকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ আটক করলো?
২) যদি সে একজন অপরাধী হতো, কেন তাকে আমেরিকাতে বিচারের ব্যবস্থা করলো না?
৩) কে তাকে কানাডা কতৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করলো না, যদিও সে একজন কানাডিয়ান নাগরিক ?
৪) কেন তাকে দশদিন জর্ডনে রাখা হলো ?
৫) কেন তাকে সিরিয়ায় পাঠানো হলো?
৬) সিরিয়া কতৃপক্ষ কে ৩৭৫ দিনে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে ব্যর্থ হল?

৭) আমেরিকান কতৃপক্ষ কেন তাকে শুরু থেকেই আত্নপক্ষ সমর্থনের লক্ষ্যে একজন আইনজীবি দিলনা?
৮) আমেরিকান কর্তৃপক্ষের কাছে তার সমস্ত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কেন তার পরিবারকে তার আটকের খবর জানালো না?
৯) আর কতোজন মানুষকে এভাবে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে নির্যাতনের সন্মুথিন করছে আমেরিকা?
১০) আর কতজন মানুষ শুধু মাত্র সন্দেহের বলি হয়ে নির্যাতন আর বিনাবিচারে কারাবাস করছে?

এতসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে হয়তো আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

যতটুকু জানা যায়, ৯/১১ এর পর আমেরিকার সরকার তাদের কথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"এর অংশ হিসাবে পৃথিবীর সকল দেশের সাথে গোপন তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। এর অংশ হিসাবে আব্দুল্লাহ্ আল মালকি নামক একজন সন্দেহভাজন আল-কায়দা সদস্যের (যে এখন সিরিয়ার নির্যাতন কেন্দ্রে আছে) পরিবারের সাথে মেহারের জানাশুনার সুবাদে তাকে সন্দেহের তালিকায় আনা হয় । জেকেএফ বিমান বন্দরে যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক করা হয় তখন কানাডার স্পাই এসেন্সী সিসাস (**CSIS**) অথবা আরসি এমপি (**RCMP**) আমেরিকান সংস্থাগুলোকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে ।

মেহার আরার বলেন - Then they pulled out a copy of my rental lease from 1997. I could not believe they had this. I was completely shocked.

১৯৯৭ সালের বাড়ী ভাড়ার দলিল যখন আমেরিকান কর্তাদের হাতে তখন বুঝা যাচ্ছে যে মেহার আরার দীর্ঘদিন যাবৎ কারো নজরে ছিল। লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, এয়ারপোর্টে যখন এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছিল তখন আরার বারবার একজন আইনজীবির জন্যে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তাকে তা দেওয়া হয় নি, মেহার বলছেন - This interrogation continued until midnight. I was very, very worried, and asked for a lawyer again and again. They just ignored me. Then they put me in chains, on my wrists and ankles, and took me in a van to a place where many people were being held in another building by the airport.

পরে তাকে একজন আইনজীবি দেওয়া হয় যে তার সাথে ৩০ মিনিট আলাপ করে - কিন্তু সেটাই শেষ। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাকে তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা তাকে কখনই জানতে দেয়নি। তাকে চাপের মুখে একটা ফরমে সাইন করিয়েছে যাতে তাকে সিরিয়া পাঠানোর রাস্তা পরিষ্কার হয়। মেহার বলছেন - They asked me to sign a form. They would not let me read it, but I just signed it. I was exhausted and confused and disoriented. I had not slept or eaten since I was in the plane. At about 6:00 in the evening they brought me some cold McDonalds meal to eat. This was the first food I had eaten since the last meal I had on the plane.

তারপর তাকে জানানো হলো INS এর প্রধানের নির্দেশে তাকে সিরিয়া পাঠানো হচ্ছে। সে অত্যান্ত ভীত হয়ে গেল এবং সিরিয়া বন্দী নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বললে তারা বলল - INS was not the body that deals with Geneva Conventions regarding torture.

বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে সে অক্টোবর ০৯, ২০০৩ জর্ডানের আম্মানে এসে পৌছল। সেখান থেকে শুরু হলো অমানুষিক নির্যাতন। সেটা সিরিয়াতে গিয়ে আরো বাড়লো। সে অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরন আছে মেহারের বক্তব্যে। আর মেহারের দুর্বিসহ জীবন সম্পর্কে কল্পনা করার জন্যে যারা তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে এসেছেন তাদের জন্যে একটু অনুমান শক্তিই যথেষ্ট।

সিরিয়ার নির্যাতনের কারন হিসাবে সে বলেছে, তাকে বারবার বলা হয়েছে সে আর-কায়দার সদস্য সেটা স্বীকার করতে। নির্যাতনকারীদের একমাত্র কাজ ছিল তাকে আল-কায়দার সদষ্য হিসাবে স্বীকারোক্তি আদায় করা।

আমেরিকান মিডিয়া আর কিছু গোষ্ঠী প্রবলভাবে প্রচারনা চালাচ্ছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসলে মুসলমান দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ । সে ক্ষেত্রে সিরিয়ার মতো একটা অগনতান্ত্রিক মুসলিম আরব দেশ - যেখানে আল কায়দা সক্রিয় বলে বিশ্বাস - সেখানে আমেরিকা তার বন্দীদের পাঠায় কোন যুক্তিতে? এ ঘটনা থেকে কি প্রমানিত হয় না যে, সিরিয়ার সাথে অমেরিকার একটা গোপন সম্পর্ক আছে যা সাধারন মানুষ জানে না? এটা কি শুধুমাত্র নির্যাতন করে তথ্য আদায় না - এটা আমেরিকান নীতি-আদর্শের পরিবর্তনের ঈঙ্গীত? যে দেশেই জন্ম হোক - যে ভাষাই কথা বলুক - মানবাধিকারের দৃষ্টিতে সবাই সমান। আসলে কি তাই - অন্তপক্ষে বর্তমান কালে আমেরিকান নীতিতে কি এর প্রতিফলন দেখা যায়?

এমনেষ্টির বরাত দিয়ে সিবিসির সর্বশেষ খবরে প্রকাশ সর্বমোট সাতজন কানাডিয়ান মধ্যপ্রাচ্যের নির্যাতন কেন্দ্র গুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্দী জীবন যাপন করছে - তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ আলমালকি একজন। আল-মালকি একজন সিরিয়ান- কানাডিয়ান যিনি ইলেকট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রেজুয়েশন করার পর একটা ইলেকট্রিক্যাল মালামাল ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। মে ২০০২ এ মাকে নিয়ে দেশে বেড়াতে গেলে দামাস্কাস এয়ারপোর্ট থেকে তাকে আলাদা করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর, অক্টোবর ২০০২ এ জানা যায় যে সে সিরিয়ার একটা জেলে আছেন । এমনেষ্টি বলছে - 'Abdallah al-Malki has reportedly been subjected to a form of torture known as the dullab, which involves hanging the victim from a suspended tyre and beating him or her with sticks and cables. He has apparently also been given electric shocks and has been beaten around his body with cables as well as kicked in the head. 'Abdallah al-Malki is said to be in poor health and to have lost a lot of weight. দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয়নি - এমনকি তাকে আত্নীয় বা আইনজীবির সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এমনেষ্টির বক্তব্য - It is thought that 'Abdallah al-Malki is being held in connection with alleged "terrorist" activities but he has not been charged with a recognizable criminal offence.

আল-মালকি সম্পর্কে কানাডার মানুষ কখনই জানতে পেত না, যদিনা মেহার আরার তার বক্তব্যে আল-মালকির কথা উল্লেখ না করতো। রবিবারে (নভেম্বর ০৯, ২০০৩) সিবিসি রিপোর্টে আব্দুল্লাহ্ আল-মালকির ভাই ইউসুফ আল-মালকির সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সেটা ছিল আরো ভয়াবহ। একটা পবিবার কিভাবে দীর্ঘ ২ বৎসর তাদের এক নিখোঁজ সদস্যের জন্যে ভয়ার্ত ও উৎকন্ঠিত দিন যাপন করেছে তার এক দলিল এ সাক্ষাৎকার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ইউসুফ বলছে - তারা তাদের পরিবারে সদস্যকে হারিয়ে যতটানা চিন্তিত ও দুঃখিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ভীত তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারন তার ভাই হারানোর পর কানাডা পুলিশ কয়েকবার তাদের বাড়ীতে হানা দিয়েছে এবং তল্লাশি চালিয়েছে। তাদের পরিবার সবসময় ভীত এ ভেবে - যে কোন সময় তাদের সিরিয়ায় ডিপোর্ট করা হতে পারে - যা তাদের জন্যে হবে ভয়াবহ বিপর্যয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে যখন রাষ্ট্রযন্ত্র একদল মানুষকে সন্ত্রস্ত করে - সেটা কি এক ধরনের সন্ত্রাস নয়? অবশ্যই সন্ত্রাস। আর এটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের কাছে পরাজয়ও বটে। কারন যখন একটা মানবিক সমাজ সন্ত্রাসবাদের নীতিকে নিজেদের নীতি হিসাবে গ্রহন করে - পক্ষান্তরে সেটা সন্ত্রাসবাদের বিজয় হয় - সেটা বুঝতে মানুষের তেমন কষ্ট হয় না।

শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে একজন মানুষকে এভাবে বিনাবিচারে নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। কার সন্দেহ ? সিরিয়ার, না। আমেরিকান কর্তৃপক্ষের সন্দেহ। এটা সুস্পষ্ট যে - সিরিয়ার এ নির্যাতন ক্যাম্পগুলো আমেরিকান কর্তৃপক্ষের বর্ধিত (Extension) হিসাবে কাজ করছে। এটাই হচ্ছে মানবাধিকারে প্রতি একটা অশনি সংকেত। একটা প্রবল পরাক্রমশালী শক্তি যখন মানবাধিকারে কথা বলে আর মানবাধিকার লংঘনের জন্যে "মানবাধিকার অবজ্ঞাকারী দেশের" সহায়তা নেয় - মানবজাতির জন্যে এটা পরম আতঙ্কের বিষয় বটে! আমেরিকা তার দ্বিমুখী নীতি ফলে একদিকে ইরাকে হাজার হাজার মানুষ মারছে তথাকথিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আর পাশের দেশের

মানবাধিকার বিরোধী সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে সহায়তা দিচ্ছে যাতে তাদের নির্যাতনের পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যায়।

প্রসংগক্রমে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ৯০ দশকের প্রথম ভাগে এলিয়েদা নামে আমেরিকান এক মেয়ে হেরোইন চোরাচালানের অপরাধে বাংলাদেশের আদালতে মৃতুদন্ডে দন্ডিত হয়। বাংলাদেশে আমেরিকান দূতাবাস তাকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনী সহায়তা দেয় এবং সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন করে । যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়- তখন সে সময়ের প্রভাবশালী সিনেটর (পরে মন্ত্রী) বিল রিচার্ডসন নিজে গিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে সে অপরাধীকে সাথে করে আমেরিকায় নিয়ে আসে। সেটা ছিল বাংলাদেশের নব্বই এর গনতান্ত্রিক আন্দোলনের পর নতুন গনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে চলার পথে তার বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটা চরম অপমান এবং একটা বড় আঘাত। সেটা আরো প্রমান করে যে, আমেরিকানরা তৃতীয় বিশ্বের বিচার ব্যবস্থার উর্দ্ধে। সে অবস্থায় আমেরিকা যখন তার বন্দীদের নির্যাতনের জন্যে তৃতীয় বিশ্বে পাঠায় তখন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে - আমেরিকান মানবাধিকারের মুখোশটা কি ফিকে হয়ে যাচ্ছে?

টরন্টো
নভেম্বর ০৯, ২০০৩